প্রথম অধ্যায়

সাহিত্যের অপর ভুবন : প্রশ্ন ও বিতর্ক

উত্তর-পূর্ব ভারতে এক অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় ১৯৮০ সালে আসাম সহ। এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয় বাঙালি সমাজ ও বাঙালির সাহিত্য শিল্পকে। সেই সময় উত্তর-পূর্ব ভারতের বাঙালিদের মনে হয়েছিল তারা দুই বাংলার বাঙালি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তখন তাদের মনে হতো অন্য এক নতুন ভুবনের বলে। যা অন্য অঞ্চলের মানুষ তা অনুভব করতে পারছে না। তাই এই নতুন ভুবন নিয়ে বিজিৎ কুমার ভট্টাচার্য একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন ''উত্তর-পূর্ব ভারতের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা : সমস্যা ও সম্ভাবনা— তৃতীয় ভুবন''। তিনি প্রথম ''বাংলা সাহিত্যর তৃতীয় ভুবন'' কথাটি ব্যবহার করেন। এই প্রবন্ধটি ১৯৮১ সালে 'অনীশ্বর' পত্রিকায় প্রকাশ করেন শ্রীমান দেবাশিস চন্দ। তারপরেও দেখা যায় মিথিলেশ ভট্টাচার্যও এই তৃতীয় ভুবন শব্দটি তার ছোটগল্পে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু অনেকে এই তৃতীয় ভুবন বলতে সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতকে বুঝিয়েছেন, যার মধ্যে রয়েছে আসাম এবং ত্রিপুরা। তিনি তৃতীয় ভুবন বলতে শুধুমাত্র বরাক উপত্যকা বোঝাননি, বরাক উপত্যকা হল তৃতীয় ভুবনের একটি অংশমাত্র। অনেকেই আবার তৃতীয় ভুবন বলতে বুঝিয়েছেন বরাক উপত্যকাকে। তবে এই যুক্তি বিজিৎ কুমার ভট্টাচার্যের কাছে অযুক্তিক। উত্তর-পূর্ব ভারতে বাংলা সাহিত্য চর্চা হতো লিটল ম্যাগাজিনের উপর ভিত্তি করে। 'সাহিত্য' পত্রিকাটি এ অঞ্চলের সব চেয়ে বেশিদিন স্থায়ী হয়েছিল এবং এটিই সবচেয়ে নিয়মিত ভাবে বেরতো।

উত্তর-পূর্ব ভারতে ১৯৮০ সালটি ছিল ভয়াবহ। তখন দেখা দিল মানুষের

প্রতি মানুষের বিদ্বেষ, অবিশ্বাস, হানাহানি, গণহত্যা। গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া। এই রকম একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। ভারতে এই তৃতীয় ভুবনটা কোনো রকম ভাবে দেশের সঙ্গে জুড়ে আছে। তৃতীয় ভুবনে বহু জাতি, উপজাতি এবং বহু ভাষা-ভাষী মানুষ এক সঙ্গে বাস করছে। কিন্তু মানুষের এই ঐক্য ভাঙতে থাকে রাজনৈতিক চক্রান্তে যার ফলে বিভিন্ন রাজ্যের সৃষ্টি হয়।

তৃতীয় ভুবনে জাতি-উপজাতি মিলিয়ে বাঙালির সংখ্যা বেশি হলেও তারা আজ সংখ্যালঘু। কিন্তু যারা সংখ্যায় কম তাদের শাসন মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে। এই অঞ্চলের বিভিন্ন সময়ে কত ধর্মের মানুষ, কত ভাষার মানুষ মিলিত হয়েছে যা প্রকৃতির নিয়মে আর এটাই বাস্তব। অসমীয়া নিজেদেরকে বলে 'সন অব দি সয়েল'। আসলে অসমীয়ারাও বেশি দিন হয়নি আসামে এসেছে অথচ তারা এই দাবি করছে। তাদের এই যুক্তি অযুক্তিক।

বিজিৎ কুমার ভট্টাচার্যের মতে— ''কোন রাজনৈতিক প্রবন্ধ লেখা আপাতত আমার উদ্দেশ্য নয়, তবে বাংলা ভাষা এবং সাহিত্য নিয়ে লিখতে হলে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের অবস্থা, তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক পটভূমি কিঞ্চিৎ জেনে নেওয়া প্রয়োজন মনে করি। বিশেষ সময়ে, বিশেষ স্থানে একটা বিশেষ ধরনের সাহিত্যই গড়ে উঠতে পারে। ভাষা চর্চাই হোক কিংবা সাহিত্য চর্চাই হোক তা স্থান কাল নিরপেক্ষ নয়। বর্তমান বাংলা সাহিত্যের রাজধানী কলকাতা। সাহিত্যের রথী মহারথীরা প্রায় সকলেই এখন কলকাতা বা তার আশপাশের বাসিন্দা। কলকাতার বাইরেও একটা স্বীকৃত বলিষ্ঠ ধারা রয়েছে বাংলাদেশে। দুই দেশের সাহিত্যের স্বাদও আলাদা। পেশাদার প্রকাশক কিংবা সমালোচকদের দ্বারা এখনও পর্যন্ত তেমনভাবে স্বীকৃত না হলেও উত্তর-পূর্ব ভারতে বাংলা সাহিত্যের যে তৃতীয় ভুবন বর্তমান তাও উপেক্ষনীয় নয়। বাংলা সাহিত্যের সাম্রাজ্য এ অঞ্চলের সাহিত্যেরও একটা বৈশিষ্ট্য আছে-আছে অনেকখানি অবদান।" [১]

তৃতীয় ভুবনের কতগুলি অভাব রয়েছে যার ফলে আমরা অনেক কিছুই জানতে পারি না। উপযুক্ত প্রকাশক না থাকায় পাঠকের কাছে অনেক কিছু অজ্ঞাত থেকে যায়। কিন্তু নিয়মিত কোনো সাহিত্য পত্র-পত্রিকাও নেই। এখানে যে সাহিত্য চর্চা হচ্ছে তার মূলে কোন অর্থের জন্য নয়, তা হল মনের খোরাক। যথেষ্ট ব্যয় হলেও তারা সাহিত্য চর্চা করে যাচ্ছেন। যারা সাহিত্য চর্চা করছে তাদের অপরিসীম নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের ফল। বাংলা ভাষাকে বাঁচাতে তারা সাহিত্য চর্চা করছে। তৃতীয় ভুবনের বাঙালিদেরকে এক সময় রাজ্যের সরকারী প্রশাসন চেষ্টা করছে বাঙালির ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি চর্চা বন্ধ করতে এবং প্রশাসন ও পুলিশ মিলে বাঙালিদের তাড়াতে চাইছে। কিন্তু বাঙালিদের পালাবার কোনো পথ নেই তারা প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রাণ দিয়ে, তার শিক্ষা দিয়ে বাঁচাতে চেয়েছে ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হয় উনিশশো সাতচল্লিশ সাল যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, তেমনি দেশভাগও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। দেশভাগের ফলে সৃষ্টি হয় এপার বাংলা ও ওপার বাংলা। দুই বাংলার মাঝখানে সৃষ্টি হয় প্রাচীর বা দেওয়াল। বিজিৎ কুমার ভট্টাচার্য তৃতীয় ভুবন বলতে বুঝিয়েছে উত্তর-পূর্ব ভারতকে, এখানে তিনি আলাদা করে বোঝাতে চেয়েছে নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে পড়েও বাঙালিরা কত ধৈর্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে সাহিত্য চর্চা করছে। তাই তিনি উল্লেখ করেছেন ‘‘বিশেষ সময়ে বিশেষ স্থানে একটা বিশেষ সাহিত্যই গড়ে উঠতে পারে। ভাষা চর্চাই হোক কিংবা সাহিত্য চর্চাই হোক তা স্থান কাল নিরপেক্ষ নয়। আবার এও সত্য যে একটি ভাষায় একটিই সাহিত্য হয়, তাই বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্য তার বিশেষ বিশেষ স্থানের এবং কালের বৈশিষ্ট্য নিয়ে এক বাংলা সাহিত্যই। অখণ্ড বাংলা সাহিত্যেই বেড়ে উঠেছে, বিভিন্ন ধারাকে গ্রহণ করে পশ্চিমবঙ্গে, বাংলাদেশে, উত্তর-পূর্ব ভারতে কিংবা আরো নানা স্থানে।’’

দেশভাগের ফলে আমরা পূর্ববাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। কিন্তু ভারতের সঙ্গে যুক্ত হলেও পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমরা অনেক দূরে। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বরাক উপত্যকা ও ত্রিপুরার যে স্থল পথ আছে তা কয়েক দিন সময় লাগবে। বিশেষ করে এ অঞ্চলের যে স্থল পথের দুর্বল যোগাযোগ ব্যবস্থা তা আমাদের দূরত্ব আরও বাড়িয়ে দেয়। এই বরাক উপত্যকা ও ত্রিপুরার অঞ্চলের মানুষ আবদ্ধ হয়ে পড়লো, যা বাঙালির এক নতুন ভুবন নামে। এই ভুবনের সাহিত্যিকের লেখা কলকাতা কেন্দ্রিক প্রকাশন তাদের প্রতি কোন আগ্রহ দেখান না। কিন্তু বাংলাদেশে ঢোকার রাস্তাও বন্ধ। কিন্তু এই রকম সংকটের মধ্যে পড়েও সাহিত্য চর্চা কারো হাত পা গুটিয়ে বসে থাকেননি। তারা সব সময় সাহিত্য চর্চা করে চলেছে। এই যে নতুন ভুবন নাম হয়েছে তা করেছেন ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, সামাজিক কারণেই। কিন্তু ত্রিপুরার ভাষা বাংলা সেই ত্রিপুরার রাজ আমল থেকেই। বর্তমানে 'ককবরক' রাজ ভাষার স্বীকৃতি পেয়েছে। ''ইংরেজ আমলে যখন কোনও ভারতীয় ভাষাই কোথাও রাজ্য ভাষার সম্মান পায়নি, ব্যবহারিক জীবনের দৈনন্দিন কর্মতালিকার সবটাই শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ ইংরাজী ভাষা গ্রাস করে নিয়েছে, তখনও ত্রিপুরা সগর্বে বাংলা ভাষার জয়ধ্বজা উড়িয়েছে, ইংরেজের কাছে নতিস্বীকার না করে।" (ত্রিপুরার বাংলা সাহিত্য। অপরাজিতা রায়। ত্রিপুরা বরাক উপত্যকা সাহিত্য সম্মেলন স্মরণিকা, ১৯৯০) শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র দেববর্মা ''ত্রিপুরার ককবরক সাহিত্য বিকাশের ধারা' শীর্ষক প্রবন্ধে (সাহিত্য নবপর্যায় ১৪, পৃষ্ঠা-৯, ১লা বৈশাখ ১৩৯৮) লিখেছেন রাজা ধর্মমাণিক্যের (রাজত্বকাল ১৪৩১-১৪৬১ খ্রিস্টাব্দ) আদেশে রাজমালা বাংলা (সু-ভাষা) ভাষায় অনূদিত কিংবা নতুন ভাবে লিখিত হয়। ত্রিপুরার রাজ ভাষা বাংলা হলেও বাঙালির জীবনের দুর্দশার অন্ত নেই। উপজাতিদের কাছে বাঙালিরা নির্যাতিত হচ্ছে। এইসব অঞ্চলের বাঙালির যে করুণ অবস্থা তা বাংলাদেশের বাঙালি ও

পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা তা অনুভব করতে পারবে না। তাই এই অঞ্চলের বাঙালি জীবনের আলাদা জগৎ গড়ে উঠেছে। এই সব দিক দিয়ে বিচার করে বিজিৎ কুমার ভট্টাচার্য তৃতীয় ভুবন নাম করেছেন।

বাংলা সাহিত্যের প্রধান প্রকাশন হল কলকাতা। পশ্চিবঙ্গের বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি এবং তাদের ছত্রছায়ায় লেখকরা এ অঞ্চল সম্পর্কে উদাসীন। ১৯শে মে ও ২১শে ফেব্রুয়ারী এই দুটি দিন বাংলা ভাষা বাঁচাতে গিয়ে বাঙালি শহীদ হয়েছেন। 'দুই বাংলার ভালোবাসার কবিতা' সংকলনের ভূমিকায় শামসুর রাহমান এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মত বিখ্যাত কবিরা লিখেছেন ওপার বাংলার মত ভারতে বাংলা ভাষার উপর কখনো আক্রমণ হয়নি। তাই বিজিৎ কুমার ভট্টাচার্য আক্ষেপ করে লিখেছেন— ''তাঁদের এই বিস্মৃতি আমাদের কেবল ব্যথিতই করে না, আমরা স্পষ্ট অনুভব করতে বাধ্য হই পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের থেকে আলাদা বাংলা সাহিত্যের অন্য এক ভুবনে আমরা বাস করি।''[৩]

এই নুতন ভুবনের বাঙালির সাহিত্য চর্চার পেছনে রয়েছে অপরিসীম নিষ্ঠা ও পরিশ্রম, ধৈর্য। সাহিত্য চর্চা কারো জীবিকা অর্জনের পথ নয়, তারা নিজের তাগিদে সাহিত্য চর্চা করে গেছেন তারা খ্যাতি লাভের আশাও করেননি। তারা বাংলা ভাষাকে টিকিয়ে রাখার জন্য সংগ্রাম করে চলেছে। বাংলা ভাষাকে মনে প্রাণে ভালোবাসার ফলেই তাঁদের এই সাহিত্য চর্চার নিরলস প্রয়াস আজও অব্যাহত।

উত্তর-পূর্ব ভারতে অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যে তৃতীয় ভুবনে যে ছোটগল্প লেখা হচ্ছে তা অনেকেই ভালো গল্প বলে মেনে নিতে পারছেন না। কারণ হয়ত না পড়েই বা অবহেলা করেই বলে দিচ্ছে। আসলে ইতিমধ্যে অনেক গল্পকারকে আমরা দেখতে পাচ্ছি তারা হল— বিমল চৌধুরী, বনমালী গোস্বামী, বিশ্বজিৎ

চৌধুরী, অখিল দত্ত, মলয়কান্তি দে, অরিজিৎ চৌধুরী, দুলাল ঘোষ, বদরুজ্জামান চৌধুরী, মিথিলেশ ভট্টাচার্য, অনুপ ভট্টাচার্য, শ্যামলকান্তি ভট্টাচার্য, দেবব্রত দেব, দীপক দেব, শেখর দাশ, রণবীর পুরকায়স্থ। উত্তর-পূর্ব ভারতে বাংলা ছোটগল্পকারের মন, মানসিকতা, তাদের অবস্থান ইত্যাদির দিকটাও গুরুত্ব পেয়েছে। প্রযুক্তি বিজ্ঞানের যুগে মানুষকে সমস্ত বিশ্বকে যেমন হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছে তেমনি প্রতিবেশীকেও দূরে ঠেলে দিয়েছে তা ভুললে চলবে না। তাই দেখা যায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাংলা গল্পের সঙ্গে কলকাতা বা ঢাকার গল্পের তফাৎ ঘটে। আবার ঐ ব্যক্তিত্ব গড়ার পেছনে দেশ-কালের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। এছাড়াও সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবেশের প্রভাব রয়েছে সাহিত্য চর্চায়। ত্রিপুরার কথা সাহিত্যিক কার্তিক লাহিড়ী মনে করেন : 'কবিতায় বাস্তবের রক্তাক্ত চিহ্ন মুছে ফেলা যায় সহজে, কিন্তু ছোটগল্প যতই আত্মমুখী হোক ব্যক্তি তার কেন্দ্রে থাকে বলে ছোটগল্পকারকে ও মনস্ক থাকতে হয় বাস্তবতার জটিল তীক্ষ্ণ চোখের সামনে।'[৪]

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যে সাহিত্য চর্চা হতো তা মূলতঃ লিটল ম্যাগাজিনের উপর নির্ভর করে রচিত। তাতে ভালো মন্দ দুটো দিকই আছে। এই লিটল ম্যাগাজিনে প্রধান ও অপ্রধান অঙ্গ লেখকেরাই সাহিত্য রচনা করতেন। এই তৃতীয় ভুবনে যে ছোটগল্প পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তা হল— আসাম থেকে 'পূর্বদেশ' (সম্পাদক- অখিল দত্ত) এবং ত্রিপুরা থেকে 'পদক্ষেপ' (সম্পাদক- অনুপ ভট্টাচার্য) ও 'মুখ' (সম্পাদক- দেবব্রত চক্রবর্তী), 'পরম্পরা' (সম্পাদক- মিথিলেশ ভট্টাচার্য)। এছাড়া আরো কয়েকটি পত্রিকা বাংলা ছোটগল্প চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। গৌহাটির 'একাল' (সম্পাদক- শিব ভট্টাচার্য), 'সময়' (সম্পাদক- বিশ্বজিৎ চৌধুরী), শিলচরের 'শতক্রতু', শিলঙের 'সীমান্তের কথা', মুরজ, আগরতলার 'পৌণমী', 'জাতক', ধর্মনগরের 'স্বপ্ন এবং দুঃস্বপ্ন' (সম্পাদক- পীযুষ রাউত)।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের লেখকদের সম্পর্কে শিব ভট্টাচার্য লিখেছেন— ''এঁরা (আসামের ছোটগল্প লেখকেরা) কলকাতার প্রতিষ্ঠিত গল্প লেখকদের প্রতিস্পর্ধী নন ঠিকই কিন্তু এদেরকে পরিপূরক শক্তি হিসেবে মেনে নিলে বাংলা ছোটগল্পেরই লাভ।''[৫]

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাঙালি জীবন, বাংলাদেশ কিংবা পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনেকটা আলাদা। এই অঞ্চলে বিভিন্ন জনজাতি বাস করে, যেমন— মিজো, নাগা, খাসি, মণিপুরি, ত্রিপুরি, অসমিয়া, অরুণাচলি। এই অঞ্চলে বাঙালি সমাজে বাঙালি লেখকরা এক নতুন ভুবন দেখতে পেয়েছে যা তাদের সাহিত্য চর্চায় তুলে ধরেছে এই নতুন ভুবনে। বরাক উপত্যকার বাঙালিরা পঞ্চাশের শেষ ষাটের শুরুর সময় এক বড় আন্দোলন হল ৬১ এর ভাষা আন্দোলন। এই আন্দোলনে এগারোজন শহিদ হন।

বরাক উপত্যকার অন্যতম ছোটগল্পকার রণবীর পুরকায়স্থ। তাকে জটিলতার অভিযোগ করেছেন আরেক গল্পকার। শিব ভট্টাচার্য মনে করেন— ''রণবীর জীবনকে দেখেন ঠিকই তবে বড় বেশি জটিলতার আড়ালে। ... এত বেশি জটিলতায় পাঠক ধৈর্য এবং কাহিনিক্রম দুটোই হারিয়ে ফেলে।''[৬] গল্পকার রণবীর পুরকায়স্থ এক চিঠিতে লিখেছেন, 'গদ্যকার হতে পারিনি ভাষা শিল্পের বিভিন্ন মাপের সূচে বিভিন্ন মাপের সূতো পরাতে পারিনি বলে' (সম্পাদক সমীপে, সাহিত্য নবপর্যায় ২১) আসলে লেখক রণবীর পুরকায়স্থের গল্পে কাহিনি আছে কিন্তু তার গল্পে উপকাহিনিও অপ্রাসঙ্গিক ঘটনার প্রাচুর্য থাকায় বেশি জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। শেখর দাশও বরাক উপত্যকার এক শ্রেষ্ঠ গল্পকার। তাকে শিব ভট্টাচার্য দেখেছে ভালো মন্দ সব কিছু মিলিয়েই। তিনি লিখেছেন : 'শেখর দাশ বেশ শক্তিমান গল্প লেখক এ জন্য যে এর গদ্যে এক অনন্য সাধারণ স্টাইল আছে, ... প্রতীকের সার্থক এবং বলিষ্ঠ প্রয়োগ তার শক্তির পরিমাপ দেয়। ... কিন্তু এই অকৃপণ প্রতীকের প্রয়োগেই তার গল্পের অন্যতম দুর্বলতা।'[৭] যুগ সম্পর্কে

বলতে গিয়ে বলেছে— 'যে যুগ ফাটা দর্পণে নিজের কুৎসিত অবয়বের ততোধিক কুৎসিত প্রতিবিম্ব দেখে ভীত, সন্ত্রস্ত, সংক্ষুব্ধ, উন্মত্ত এবং কখনো বা অসহায়।'[৮]

সময় ভাবনাকে নিয়ে লেখক পাঠককে দেয় নানা তত্ত্বের ধারনা। কখনো বাস্তবে বহুমাত্রিক ধারণা ও আধুনিক অবক্ষয় সংকট মোচনের ইঙ্গিত দেন। বিশেষ ভাবে সর্বত্রই স্বীকৃত হয় আধুনিকতার বিশ্বস্ত প্রকাশ। সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতে বাংলা সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে পাঠক ও সমালোচককে একত্রিত করতে সাহায্য করেছে এই অঞ্চলে লিটল ম্যাগাজিন বা ছোট কাগজ। এক কথায় বলতে গেলে লিটল ম্যাগাজিন নির্ভর। এই ছোটগল্পে এ অঞ্চলের নানা দিকগুলি ফুটে উঠেছে। বলতে গেলে সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতে বাংলা ভাষা চর্চা হল জলে কুমীর ডাঙায় বাঘের মতো। উত্তর-পূর্ব ভারতে বিভিন্ন উপজাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বাঙালির বিবাদ বাঁধিয়ে দেওয়া এবং হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সক্রিয় করে তুলে রাজনৈতিক মহল। এই সব ঘটনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে ছোট পত্রিকায়। এই অঞ্চলে প্রচুর ছোট কাগজ বেরিয়েছে অনিয়মিত ভাবে। এই বরাক উপত্যকায় ছোট কাগজের দৌলতে বাংলা ছোটগল্প বেঁচে আছে। বলতে গেলে শুরু থেকে আজ অবধি এই লিটল ম্যাগাজিনের উপর বেঁচে আছে। বর্তমানে অনেক লেখক এই বরাক উপত্যকায় যে ছোটগল্প লিখেছেন তারাও এই ছোট কাগজের উপর নির্ভর করে। বরাক উপত্যকার ছোটগল্প বিকাশের ক্ষেত্রে অন্যতম ছোট কাগজ হল— 'শতক্রতু', 'সাহিত্য', 'বেলাভূমি', 'অক্ষরবৃত্ত', 'অনিশ' ইত্যাদি পত্রিকা।

অপর ভুবনে বাংলা সাহিত্য চর্চা করতে গিয়ে লেখকদের অনেক সময়ও পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে। এই লড়াই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, তাছাড়াও রয়েছে ভাষা ও সাংস্কৃতিক রক্ষার জন্য রয়েছে সংগ্রাম। তাই লেখককে সব সময় নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগোতে গেলে তাদের বিলাস ও আত্মতৃপ্তি থেকে দূরে সরে যেতে হয়। তাই লেখকের চোখে

ধরা পরে জীবন, তার বাস্তবতা, মৌল চালিকাশক্তি। বর্তমান সময়ে পৃথিবী এক অস্থির পরিস্থিতিতে আছে যেখানে মানুষের সম্পর্ক প্রতি মুহূর্তে বদল ঘটেছে। তেমন ভাবেই বাংলা সাহিত্যও অস্থির, অনিশ্চয়তা ও সংশয়ের মধ্যে কাল যাপন করছে, সাহিত্যও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদল ঘটছে। তাই সময় ও পরিসরের মধ্যে পড়ে ছোটগল্পও আজ নতুন বিষয়বস্তু ও প্রাকরণিক বিন্যাসে পরিণত হচ্ছে।

বাংলা সাহিত্যের হাজার বছরের পথ চলায় ছোটগল্প নিঃসন্দেহে এক সমৃদ্ধতর ধারার প্রতি ইঙ্গিত করে। ছোটগল্পের প্রথম সার্থক শিল্পী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে আজ অবধি আমাদের গল্পচর্চার ইতিহাস যেন নানা বাঁকবদলের নকশি কাঁথা হয়ে উঠেছে। কিন্তু সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের প্রথম ভুবন অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক সীমার বাইরেও বিস্তৃত বঙ্গভাষী অঞ্চলে জেগে উঠেছে সাহিত্যের ভিন্নতর সম্ভাবনা। আমাদের বরাক উপত্যকার অন্যতম কথাযাত্রী যিনি প্রায় চারদশক ধরে কলম যুদ্ধে মেতে আছে রণবীর পুরকায়স্থ, শেখর দাশ, মিথিলেশ ভট্টাচার্য।

'অপর ভুবন' অর্থাৎ বরাক উপত্যকায় বাংলা সাহিত্য চর্চা হচ্ছে। তাই পশ্চিমবঙ্গ বা কলকাতার বাইরেও যে বরাক উপত্যকা অঞ্চলে বাংলা ভাষা এবং সাহিত্য চর্চা হচ্ছে, সেখানকার সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে।

বাংলা সাহিত্যের অপর ভুবনে সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব রক্ষার নিভৃত লড়াই সাহিত্যের অন্তর্বস্তুতে, প্রকরণে, দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রকাশ পাচ্ছে। তৈরি হচ্ছে স্বতন্ত্র বাচন, স্বতন্ত্র প্রতিবেদন। বরাক উপত্যকায় উনিশে মে এর ভাষা শহিদের উত্তরাধিকার বয়ে চলেছে যে সব লিখিয়েরা, তীব্র সচেতন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চায় নিয়ে আসে নান্দনিক আধুনিকতার প্রাণবীজ।

বাংলা সাহিত্য আজ নিজ নিজ ভূমিতে অবহেলিত জীবন অতিবাহিত করতে বাধ্য হচ্ছে বাঙালির আসক্তি-নিরাসক্তি ভরা দৃষ্টিভঙ্গীর টানাপোড়নে। বিশ্বায়নের প্রবল জোয়ারে ইংরেজি ভাষার অনেকান্তিক গতিপথ, বয়ান, যার দ্রুততম গতির কাছে আজ প্রায় সবকটি আঞ্চলিক ভাষাই নিজেদের সঠিকভাবে পরিচালিত করতে পারছে না। বাংলা ভাষার পরিসর কেন্দ্রিকতার সূত্র ধরেই সাহিত্য নানা মাত্রিক প্রকাশে চর্চিত হয় নিজ নিজ পারিপার্শ্বিক অবস্থা, পরিবেশ ইত্যাদির দ্যুতিতে ভিন্ন ভিন্ন পরিসরে। আর বরাক উপত্যকা বাস্তবের পাথরে জীবন ও জগতের পরতে পরতে লুকিয়ে থাকা কুসংস্কার, সন্ত্রাসবাদ, আঞ্চলিক উপনিবেশবাদ আন্তর্জাতিক চক্রান্ত এবং মৌলবাদ ইত্যাদির মধ্যে সাহিত্যের বাচন চয়ন করে চলেছে। তাই একই সময়ে থেকেও বাংলা সাহিত্যের মধ্যে রচিত হয়েছে পরিসরগত নিজস্ব সাহিত্যিক প্রাপ্তি, উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতা আলাদা আলাদা অবয়ব ও ভাষ্য।

বরাক উপত্যকার বাংলা সাহিত্য প্রধানত লিটল ম্যাগাজিন নির্ভর অপর ভুবনের বাংলা সাহিত্য চর্চায় লেখককে সময় ও পরিবেশের সঙ্গে এক তীব্র লড়াই প্রত্যক্ষ করতে হয়। এই লড়াই কখনো সশস্ত্র সন্ত্রাসে বিরুদ্ধে, কখনও আবার তা আত্মঘাতী সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। তাছাড়াও রয়েছে ভাষিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে অস্তিত্ব রক্ষার বিরুদ্ধে। তাই আত্মতৃপ্তির বিলাস থেকে দূরে সরে গিয়ে সব সময় নিরন্তর পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে পারি দিতে হয় লেখককে, নির্ধারিত লক্ষ্যের দিকে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিন্যাসের সঙ্গে আমরা তুলে ধরতে চাই সাহিত্যিকদের চোখে দেখা জীবন, তার বাস্তবতা, মৌল চালিকাশক্তি ইত্যাদির সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের কেন্দ্রে থাকা পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের সাহিত্যিকদের বাস্তবতা, মৌল চালিকাশক্তি ইত্যাদির সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য এবং তাদের জীবনবোধ ও শিল্পবোধের দ্বন্দ্বময় আখ্যানকে।

অপর ভুবনের নান্দনিক অপরতা তৈরি হচ্ছে এ অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশের জন্য, সৃষ্টি হচ্ছে নানা মাপের ছোটবড় সমস্যাকে কেন্দ্র করে। আর এই ভৌগোলিক সমস্যার হাত ধরেই সন্ত্রাসবাদ, আঞ্চলিক উপনিবেশবাদ, মৌলবাদ, আন্তর্জাতিক চক্রান্ত, সামন্তবাদ, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা ইত্যাদি নিয়ে ভয়ানক রূপ ধারণ করেছে। এছাড়াও রয়েছে, দেশভাগের মত ট্র্যাজিক ঘটনার গভীর অভিঘাত। তাই দেখা যায় অপর ভুবনের বাংলা সাহিত্যে ভাষাগত, শিল্পিগত উৎকর্ষের চাইতে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও বিদ্রোহের সরল অথচ জোরালো উচ্চারণ প্রধান হয়ে উঠেছে।

বাঁচার জন্য প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ সংগ্রাম এবং সম্পর্কের বিভঙ্গ অনিবার্য হয়ে পড়েছে। সাহিত্য নিজেই অনেকদিন কাটিয়েছে প্রান্তিকায়িত ভাবে। তাই দেখা যায় সাহিত্যের রূপ ধরে উঠে এসেছে ক্ষোভ, দুঃখ ও হাহাকার। তাই অপর ভুবনে ছোটগল্প উপন্যাস-কবিতা-এমনকি রম্য রচনাতেও স্থান পেয়েছে দেশ ভাগ ভাষা আন্দোলনের অভিঘাত। বাংলা সাহিত্যে বরাক উপত্যকার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাংলা চর্চাও নিজ নিজ সমস্যা ও উপলব্ধির দ্যোতনায় একই বাংলা মায়ের উদ্দেশ্যে সমর্পিত হয়। তাই বিভিন্ন স্থানে পরিবেশগত পার্থক্য থাকলেও সাহিত্য রচিত হয়। একই সময়ে বিভিন্ন পরিবেশ রচিত হলে তার উপলব্ধি ও জীবন অভিজ্ঞতা আলাদা আলাদা পরিধি নির্মাণ করে। তাছাড়া পারিপার্শ্বিক সমস্যাও তার অভিঘাত এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ঠেলে দেয়। তা থেকে তৈরি নিজের চোখে দেখা বাস্তবের বোধে সাহিত্য রচনার প্রয়াস। কলকাতার কেন্দ্রিক সাহিত্যে আমরা যে নান্দনিকতার ছোঁয়া দেখতে পাই, তার থেকে আলাদা স্বতন্ত্র নান্দনিক রসদ জোগাড় করতে প্রয়াসী অপর ভুবনের লিখিয়েরা। তাই একই সময়ে থেকেও পরিসরের ভিন্নতায় সময়বোধের নতুন নতুন অবয়ব এবং কথন বিশ্বের নবতর ভাষ্য দেখতে পাওয়া যায় অপর

ভুবনের সাহিত্যে।

বরাক উপত্যকায় রয়েছে বাংলা সাহিত্য চর্চার সম্ভাবনার মুক্তদ্বার এবং সাহিত্যিক আকারের ছড়াছড়ি। বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতা এসেছে আধা সামন্ততান্ত্রিক পরিমণ্ডলের উপর ভর করে। এই অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থানের নানা সমস্যা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থেকে আধুনিকতার অর্থকে বাইরে খানিকটা গ্রহণ করেছে, অন্তরে নয়। শিল্পায়ন না হলে আধুনিকতা আসে না। বরাক উপত্যকায় বৃহৎ শিল্প হাতে গোনা দু-একটি মাত্র।

বাংলা সাহিত্যে মূল স্রোত ধারার সঙ্গে সংযোগে আকাঙ্ক্ষা ও স্বাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিকে সচেতন। তাছাড়াও দেখা যায় একই সময়ে থেকেও পরিসরের ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও সময়বোধের সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে দেখা যায় সাহিত্যিক আকারের সম্ভাবনাময় নব পরিচয় ও বৌদ্ধকতায় উপস্থিতি। আসামের বরাক উপত্যকার ছোটগল্পের বিকাশ ঘটেছে সাহিত্য পত্রিকার মাধ্যমে। এই পত্রিকাগুলি হল— শতক্রতু, সাহিত্য, বেলাভূমি, অক্ষরবৃত্ত, অনিশ ইত্যাদি। উক্ত পত্রিকাগুলির সাহায্যে বৃহত্তর বাঙালির পাঠকের কাছে সর্বজন গ্রাহ্য সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন এ অঞ্চলের কিছু গল্পকার। এই সব সাহিত্য পত্রিকায় যারা গল্প লিখতেন তাদের মধ্যে কয়েকজন আজ নিজস্ব গল্প-সংকলন নিয়ে পাঠকের সামনে উপস্থিত, এটাই এই বরাক উপত্যকার সাহিত্য চর্চার পরিসরে অনেক বড় প্রাপ্তি হয়ে দাঁড়ায়। আসামের বরাক উপত্যকায় গল্পকারদের মধ্যে যাদের গল্প সংকলিত হয়েছে তাদের মধ্যে হলো— মিথিলেশ ভট্টাচার্য, স্বপ্না ভট্টাচার্য, ঝুমুর পাণ্ডে, সৌমিত্র বৈশ্য, অমিতাভ দেবচৌধুরী, রণবীর পুরকায়স্থ, শেখর দাশ, সুব্রত কুমার রায় এবং তপোধীর ভট্টাচার্য প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

'বোকা কাশীরাম কথা' এর রূপকার রণবীর পুরকায়স্থ এই গল্পে দেখা

যায় নান্দনিক আধুনিকতার প্রতি গল্পকারের তুলনামূলক ভাবে বেশী আকর্ষণের চিত্র। তার গল্পের যে বয়ান তা পাঠকের চোখে পড়ার মতো। 'বোকা কাশীরাম কথা' গল্প সংকলনের 'দুন্দুবুড়ি কথা' যাকে সাম্প্রতিক বাংলা গল্পের ধারায় নান্দনিক আদল ও গল্পের বয়নে সার্থক উদাহরণ। এই গল্পে দেখা যায় লোককথার উপকরণের পুনপ্রয়োগ। অমলকান্তি পর্না ও চাঁপার সীমাবদ্ধ জীবনে লোককথার উপকরণ নিয়ে হাজির হয় পাঠকের সামনে। এই গল্পে জগৎ সম্পর্কে নতুন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয় গল্পকারের গল্প বীক্ষায়।

গল্পকার রণবীর পুরকায়স্থের গল্পের ভাষায় ফুটে উঠেছে নতুন দিক। তার গল্পের ভাষায় জীবন ও সাহিত্য বোধ ফুটে উঠেছে। তিনি গল্পে অত্যন্ত সচেতনভাবে ভাষা ব্যবহার করেছেন তাঁর গল্পে ফুটে উঠে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা। নান্দনিক আধুনিকতা ও প্রাকরণিক জটিলতা দেখতে পাওয়া যায় রণবীর পুরকায়স্থের গল্প বিশ্বে। গল্পকারের মধ্যে মহানাগরিক জীবন বীক্ষার স্পষ্ট প্রভাব দেখা যায়। তাঁর জীবিকা সূত্রে ভারতের নানা স্থানে ঘুরেছেন। তাঁর এই অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি ফুটে উঠেছে, শিল্পীত প্রকাশ ঘটেছে তাঁর ছোটগল্পে।

'আসমান জমিন কথা' গল্পে সপ্তাশ্ব সিকিদার ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ। সে শাখী কুর্মীকে দিয়ে ভালোবাসলেও তাকে সংসার জীবনে গ্রহণ করতে পারেনি। কারণ শাখী কুর্মী ছিল অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের কন্যা ও কুর্মী সমাজের মানুষ। এই শাখীর মঙ্গল কামনার জন্য অমরজিৎ এর সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু প্রথমে শাখী তাতে রাজী হয়নি। আর এক দিকে সপ্তাশ্ব মানসিক দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত। এখন সপ্তাশ্ব শাখীকে বলে ''যে তাকে সন্তান দেবে। ওকে অর্থের জন্য ভাবতে হবে না, ওর সব সঞ্চয়ের অর্ধেক লিখে দেবে। বলেছে, রমাকে ছেড়ে দেবে, ওর সঙ্গেই থাকবে।''[৯] শাখী কুর্মীও তার তীক্ষ্ণ জবাব দেন— ''ই ক্ষমতা তোমার নাই লালাজি। কুলিবাড়ির কালা পুড়িয়ে বিয়া করার অইলে বহুত

আগেউ করতায়।”[১০] সপ্তাশ্ব মধ্যবিত্ত মানসিকতা কেটে উঠেছে কিন্তু এই মানসিকতা যে কতক্ষন টিকে থাকবে তার নিশ্চয়তা নেই, এই নিয়ে শাখীর মনে দীর্ঘ প্রশ্ন জেগে উঠেছে। কারণ তার বিবাহিত স্ত্রী রমাকে ছেড়ে দেওয়ার কথা শাখীকে যখন বলতে পারে, কিছুদিন পরে হয়তো শাখীর সম্পর্কেও এ কথা বলতে পারে। তাই শাখী এই সব দিক বিচার করে অমরজিৎকে বিবাহ করে নেয়। এতে শাখী সপ্তাশ্বরের প্রতি ক্ষোভ, অভিমানের দিকটিও ফুটে উঠেছে। শাখীর চরিত্রের মধ্যে দিয়ে এটাই প্রমাণ করে দেয় যে নারীরা পুরুষের হাতের পুতুল বা সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র নয়। তাদের নিজস্ব স্বাধীনতা আছে, নিজস্ব চিন্তা ভাবনা আছে। এই সব দিক দিয়ে শাখী একজন সমাজের প্রতিবাদী নারী হয়ে উঠেছে।

‘তৃতীয় ভুবনের রূপকথা’ গল্পে কথাকার এক নতুন দিক তুলে ধরেছেন। এই বরাক উপত্যকার মূল ভাষা হল বাংলা ভাষা। এই বাংলা ভাষাকে উচ্ছেদ করতে চেয়েছিল অসমিয়ার কিছু জনগোষ্ঠী। এই অসমিয়াকরণের বিরুদ্ধে রুখে দাড়িয়েছে বাংলা ভাষী মানুষজন। দীর্ঘদিন ধরে এই বাংলা ভাষাকে বলে আসছে এই তৃতীয় ভুবনের মানুষেরা। এই বাংলাভাষা বাঙালিদের কাছে মাতৃদুগ্ধের সমতূল্য। এই বাংলা ভাষা বাঁচাতে গিয়ে অনেক কষ্ট, যন্ত্রণা, লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে। একটি স্মরণীয় ঘটনা ১৯৬১ সালে ১৯ মে ভাষা আন্দোলন। এই বাংলা ভাষা বাঁচাতে এগারো জন তরুণ-তরুণী শিলচর স্টেশনে পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিয়েছে। এই বরাক উপত্যকা হলো বাঙালির নয়নের মণি।

‘ওদের কথা’ গল্পে গল্পকার দেখিয়েছেন নারীর অবস্থান। এই গল্পে সুহাস একজন মাতাল, তার স্ত্রীকে কখক বৌঠান বলে ডাকতো। কথক ছিল একজন কবি সে তার বৌঠানকে ভালবাসতো। কারণ তাদের দু’জনের মধ্যে মানসিকতার মিল ছিল। অপর দিকে দেখা যায় মঙ্গালালও ছিল একজন মদ্যপানে আসক্ত ব্যক্তি। তার স্ত্রী জয়ার সঙ্গে মনের মিল ঘটত না। একদিন দেখা যায় মনে

অমিলের জন্য বুধিয়ার সঙ্গে পালিয়ে যায়। মঙ্গালাল ও জয়া এরা ছিল নিম্নশ্রেণির মানুষ। এই নিম্নশ্রেণির মধ্যে দেখা যায় নারীরা নিজের পছন্দ মতে আবার বিয়ে করতে পারে, কারণ তাদের সমাজে মেনে নেয়, তা অবশ্য বৌঠানের জানা ছিল। কথক বৌঠানের কাছে জানতে চেয়েছিল আমাদের সমাজে চলে কিনা। কথকের কথা শুনে নিরব থাকেন। কারণ তার বিয়ে হয়েছে সুহাসের সঙ্গে, তাই আবার বিয়ে করা সম্ভব নয়, সামাজিক অনেক বাধা আসে, এই বাধা থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিল কথক। কারণ দীর্ঘদিন সংসার করার পর যেন তার শিখর মাটির অনেক গভীরে চলে গেছে, তা আর উপড়ানো সম্ভব নয়। সমাজ তার ইচ্ছাকে দমিয়ে রেখেছে। তাই দেখা যায় নিম্নশ্রেণির নারী জয়া বৌঠান থেকে অনেক স্বাধীন ও মুক্ত।

তথ্যসূত্র :

১. উত্তর-পূর্ব ভারতের বাংলা সাহিত্য (প্রথম খণ্ড), পৃঃ ১১-১২

২. তদেব, পৃঃ ১৬

৩. তদেব, পৃঃ ২১

৪. ভূমিকা, ত্রিপুরার গল্প উত্তর সত্তর, সম্পাদক- নিলিপ পোদ্দার, পৌণমী প্রকাশন, আগরতলা, ১৯৯২

৫. উত্তর-পূর্ব ভারতের বাংলা সাহিত্য (প্রথম খণ্ড), পৃঃ ২৯

৬. তদেব, পৃঃ ৩৭

৭. তদেব, পৃঃ ৩৯

৮. অতন্দ্র চতুর্থ সংকলন, সম্পাদকীয় মন্তব্য

৯. 'আসমান জমিন কথা', পৃঃ ১৮১

১০. তদেব, পৃঃ ১৮১